ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2051-2059
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.466

মিথ-পুরাণের আধারে বাংলা প্রতিবাদমুখর কবিতা

ড. সপ্তর্ষি রায়, *সহশিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঠভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

For a conscious individual, protest is an innate process of life. To fail to roar—with the force of reason—against any injustice in one's surroundings constitutes an affront to human dignity. Poetry stands as one of the foremost genres of literature. When this poetry evolves into an active medium of protest, it gains the capacity to rapidly galvanize a response among the masses. When poets employ 'myth' and 'mythology' (or Purana) as pivotal vehicles to imbue this protest with novel forms, it evokes a multidimensional consciousness within the reader's mind. Traditional folklore—transmitted across generations and inextricably interwoven with the human psyche—constitutes 'myth.' 'Mythology' (or Purana), on the other hand, refers to tales of antiquity. However, unlike myths—which are primarily disseminated through oral tradition—mythology is propagated predominantly through its own written forms. Thus, although 'myth' and 'mythology' are often uttered in tandem, they remain distinct entities when examined through the lens of their origins. Nevertheless, in contemporary discourse, 'myth' and 'mythology' have emerged as mutually complementary concepts. The utilization of myth and mythology across various contexts within poetry has been widely observed. The central theme of this essay, however, is to explore how myth and mythology have intertwined with the language of protest in the bengali poetry of the post-independence era, thereby adding new dimensions to it. This essay analyzes the novel manifestations of myth and mythology within the protest poetry of prominent figures such as Achintyakumar Sengupta, Shankha Ghosh, Kabita Sinha, BirendraChattopadhyay, Sunil Gangopadhyay, Nirendranath Chakraborty, Sabyasachi Deb, Jayadeb Basu, and Mallika Sengupta. Furthermore, the study examines how myth and mythology have served to further sharpen the weapon of protest within the realm of poetry.

Keywords: Protest, Bengali poetry, Myth, Mythology or Purana, Post-independence era

বিগত সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু প্রতিবাদী কবিতা ও কবিকে অনেকবার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা। অজস্র প্রশ্ন উঠেছে তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা নিয়ে। সহ্য করতে হয়েছে নানান তির্যক উক্তি, বিচিত্র মন্তব্য। প্রগতিশীলতার দিকে মানুষ যত অগ্রসর হয়েছে, ততই সৃষ্টিশীলতার মধ্যে মানুষ প্রয়োগ করেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার প্রেক্ষিতে নানা সময়ে জন্ম নিয়েছে নানান বিতর্কের আবহ। প্রতিবাদী কবিতার স্বাধীনতাকে যুগে যুগে খর্ব করার প্রচেষ্টা চলেছে, প্রচেষ্টা চলেছে

কখনও প্রতিবাদী কবিকে বাক্‌রুদ্ধ করার। কিন্তু কবির কলমাস্ত্র থামেনি। যখনই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ, কবির কি করণীয় বা কতটা করণীয়— এইসব নিয়ে নিজস্ব রূপরেখা নির্ধারণের চেষ্টা করেছে, তখনই প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে আরও শক্তিশালী। কখনও সম্পূর্ণ নিরাভরণ, থেকে কখনওবা শব্দের ক্ষুরধার সাজে সজ্জিত হয়ে প্রতিবাদী কবিতা কালজয়ী হয়ে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কবিতার তেমনই এক সজ্জা মিথ-পুরাণের প্রয়োগ। প্রতিবাদী কবিতা মিথ-পুরাণের আধারে অভিনবত্ব অর্জনের যে অনবদ্য সুযোগ পায়, তা পাঠকের অনুভূতিতে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। মিথ-পুরাণ কবিতার ভাষায় প্রতিস্থাপিত হয়ে মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা বপন করে পাঠকমনে। কবি তাঁর দেখা সমাজের, তাঁর দেখা প্রতিবেশ থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতার সাজঘর থেকে বাছাই করে আনেন তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়। এই বিষয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে সংগ্রামী কণ্ঠস্বর। প্রতিবাদের প্রকাশ যখন কবিতায় মিথ-পুরাণের হাত ধরে হয়ে থাকে, তখন দীর্ঘদিনের মিথ-পুরাণের একমুখী ধারণা বহুমুখী চিন্তাচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। গড়ে ওঠে মিথ-পুরাণের নবভাষ্য।

ঐতিহ্যবাহী লোকশ্রুতি, যা যুগ পরম্পরায় বাহিত হয়ে মানবমনের বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, তা হল 'মিথ'। গ্রীক শব্দ 'mythos' থেকে ইংরাজি 'Myth' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ কিংবদন্তি, অথবা লোককথা, যা লোকমুখে প্রচারিত হত। ভারতীয় ভাষায় আবার মিথের প্রচলন ছিলনা, ছিল 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার। 'পুরাণ' হল পুরাকালীন কাহিনি। তবে, মিথের মত লোকমুখ অবলম্বনে প্রচারিত হওয়ার চেয়ে, তার নিজস্ব লিখিত রূপের মাধ্যমে প্রচারিত হয় পুরাণ। যেহেতু লিখিত রূপের চেয়ে প্রাচীনতম ধারা মৌখিক রূপ, তাই বলা যায়— পুরাণের চেয়েও মিথ তুলনামূলক প্রাচীন। মিথ আর পুরাণ তাই একত্র উচ্চারিত শব্দবন্ধ হয়ে উঠলেও, উৎসগত বিচারে সূক্ষ্ম পার্থক্যে ভিন্ন। তবে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে 'মিথ' আর 'পুরাণ' অজান্তেই হয়ে উঠেছে পরস্পরের পরিপূরক পরিভাষা, বলা যায় একপ্রকার সমার্থকবিশেষ। তাই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে 'মিথ-পুরাণ' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে একাত্মা।

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মিথ-পুরাণের নবপ্রয়োগ নবমাত্রা যোগ করে। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে মিথ-পুরাণের ব্যবহার কবিতায় নিয়ে আসে বিশেষ দ্যোতনা। "Myth is always concerned with creation. Myth explains how something came into exist."[১] আধুনিক কবিদের কাছে মিথের প্রয়োজন কবিতা-সৃজনের সঙ্গে অন্বিত। 'মহাভারতের কথা'য় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন— "পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে— শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে— বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।"[২] বাংলা কবিতা, বিশেষত প্রতিবাদধর্মী কবিতার আধুনিকতার অভিযাত্রায় মিথ-পুরাণের ব্যবহার পর্যালোচনা করা হল। "যৌথ নিজ্ঞানের উৎস থেকে জন্ম যেহেতু পুরাণকথার, তাই পুরাণকথার প্রয়োগ আমাদের নিহিত সত্তাকে স্পর্শ করে, জাগায়, তাকে উদ্দীপিত করে তোলে। হয়ে ওঠে আপতিক স্তর ভেদ করে জীবনের গভীরতম অনুভবের অলিন্দে প্রবেশ ও আত্ম অন্বেষণের অভিযাত্রা। এইখানে পুরাণকাল আর মিথভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সাহিত্যে শ্রেয়োবোধের স্বরূপ। আধুনিক বাংলা কবিতায় মিথ-পুরাণ তাই বারবার ফিরে ফিরে আসে।"[৩]

কবিতায় মিথ-পুরাণের আপাত প্রয়োগ এবং প্রতিবাদের ধারকস্বরূপ তার প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ শতকে স্বাধীনতা পরবর্তী খ্যাতনামা কবির কবিতায় মিথ-পুরাণের হাত ধরে প্রতিবাদের সুর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চলেছে। তবে, যেকোনো উত্তরসূরীর জীবনে যেমন পূর্বসূরীর অত্যাবশ্যক অবদান থেকে থাকে, তেমনই পূর্ববর্তী শতক বা দশকের এজাতীয় কবিতাগুলিও আলোচ্য কবিদের বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সর্বোপরি বাংলা কবিতার নবজাগরণ বা আধুনিকতা যাঁর হাত ধরে এসেছে, সেই মাইকেল

মধুসূদন দত্ত, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথ-পুরাণের বিচিত্র ব্যবহারে তাঁর কাব্য-কবিতার জগতকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর প্রতিবাদের কবিতায় মিথ-পুরাণের প্রয়োগ বলতেই উঠে আসে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কথা। উল্লেখযোগ্য এই পত্রকাব্যে এগারো জন পৌরাণিক নারীকে তিনি নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। পুরাণের শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী, শূর্পনখা, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, ঊর্বশী, জনা— তাঁরা কেউ তাঁদের প্রেমিক, কেউবা তাঁদের স্বামীর উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেছেন। সেই পত্রে প্রতিবাদের স্বরূপ কোথাও কোমল অথচ শাণিত, কোথাও উগ্র, কোথাওবা স্পষ্টতায় উদ্ভাসিত। পুরাণের নারীচরিত্র, যাঁরা এতদিন নির্দিষ্ট পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, তাঁদের এই অভিনব প্রতিবাদী রূপ পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে। নতুন ভাবনায় ভাবিয়ে তোলে পুরাণকথা। চিরায়ত পৌরাণিক অনুষঙ্গকে কবিরা নানা সময়ে নানান আকারে উপস্থাপন করেছেন। মিথ তথা কিংবদন্তিও এসেছে কবিতায় নানা মাত্রায়। মিথ-পুরাণ যখন প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছে, তা প্রতিবাদের স্বরূপকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্মান্ধতা বা কখনও সামাজিক দুরাচারের বিরুদ্ধে মিথ-পুরাণকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রকবিতাও প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। যেমন, 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পুরাণের অনুষঙ্গে অভিশপ্ত অহল্যাকে নিয়ে এলেন। পুরুষতান্ত্রিক শোষণের আবহে নারীর মানসিক শুদ্ধিকরণের এক নবভাষ্য নির্মাণ করলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতায় পরশুরামের মিথ ব্যবহার করে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির দম্ভচূর্ণ করে মানবিক আবেদনকে সমর্থন জানালেন। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের কবিতায় মিথ-পুরাণের প্রয়োগ প্রসঙ্গে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—

> কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ সময়েই চিরায়ত পৌরাণিক অনুষঙ্গকে ব্যক্তি-আশ্রয়ী ভঙ্গিতে আপন প্রতিভার অন্তর্গত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিরা পুরাণকে ইচ্ছামতো প্রসারিত ও সংকুচিত করেছেন। পুরাণ শুধুমাত্র কাহিনি কথনের সূত্র না থেকে বিষয়বস্তুর খাত পরিবর্তনের সূত্র হয়ে দেখা দিল।[৪]

কবিতার এই খাত পরিবর্তনের সূত্র ধরে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির কবিতায় মিথ-পুরাণ এসেছে প্রেমে-প্রতিবাদে-আত্মপ্রকাশের নানা ধারাপথে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কবিরা যখন কলম ধরলেন, তখন সমসাময়িক দেশ-কাল-সামাজিক অবস্থান বহুক্ষেত্রে কবিতায় পুরাণ-মিথের অনুষঙ্গে স্থান পেল, সর্বোপরি কবিদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল মিথ-পুরাণের নবভাষ্যচেতনা।

স্বাধীনতা পরবর্তী যন্ত্রণাদীর্ণ সময়ের কবিতায় পুরাণকে আশ্রয় করে প্রতিবাদ গর্জে উঠল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বাস্তু' কবিতাটি তারই আদর্শ উদাহরণ। দেশভাগের যন্ত্রণা আর মহাভারতের ছবি সমীকৃত হয়ে গেছে কবিতাটিতে। দেশভাগের যন্ত্রণাকে বুকে বয়ে বেড়ানো এক পরিবার খান সেনাদের নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পথে পাড়ি দেয়। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, নিশ্চিন্ত ঘুম, নিশ্চিন্ত রোজগারটুকু ছেড়ে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়াতে হল। তাই কবিতায় উল্লিখিত গৃহকর্তা ভূষণ পাল ছেলেমেয়েদের ভোররাতের স্বপ্নভরা আদুরে ঘুমটুকু ভাঙিয়ে উঠে পড়তে বলে। বাছাই না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে বেরিয়ে পড়তে হবে। নৌকো করে স্টিমার ঘাট, সেখান থেকে রেলস্টেশন— একবার ট্রেনে চাপতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বাড়ির ছোট ছেলেটি ঘুম চোখে বাবাকে জিজ্ঞেস করে— 'সেখান থেকে কোথায় যাবা?' ভূষণ পাল উত্তর দেন 'কোথায় আবার! আমাদের নিজের দেশে।' এই উত্তরটি নিতান্তই ছেলে ভোলানো উত্তর। ভূষণ পাল জানেন যেখানে যাচ্ছেন সেখানে নিজের বলে কিছু নেই। নাম নেই, আশ্রয় নেই, মুখের খাবার নেই। সেখানে একটাই পরিচয়— 'উদ্বাস্তু'। নিজের বসতভূমি, বসতবাটি,

ভদ্রাসন ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয় এমন অজস্র পরিবার। আঙিনায় গোবরছড়া আর দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, পৈঁঠে-পিঁড়ে পর্যন্ত লেপতে হবে না, গরু দুইতে হবে না, তাকে খেতে দিতে হবে না। শুধু পালিয়ে যেতে হবে। চোখে মুখে থাকবে একটাই প্রত্যাশা-যেখানে পালিয়ে বাঁচার পথ খোঁজা হবে সেখানে সব আছে, 'অনেক আছে, অঢেল আছে'— মমতামাখানো মাটি, বৈকুণ্ঠবিলাস ধান, হিজলফুলের গন্ধভরা মৃদু বাতাস— সবকিছু ফেলে রেখে মানুষগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পথে মিলিত হয় আরও উদ্বাস্তুর সঙ্গে। একদল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু, আর একদল মানুষ আদর্শ ছেড়ে উদ্বাস্তু। এতদিনকার লড়াইকে মিথ্যে প্রহসনে পরিণত করে একশ্রেণির মানুষ ঐ প্রবল দুর্দিনে নিজেরটুকু নিজে গুছিয়ে নিতেই ব্যস্ত। দেশপ্রেমের নাম করে যারা একদিন মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিল, তারা আজ দিশেহারা হয়ে ছুটছে এতদিনের পরিশ্রমের বেতন নিতে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম, একদল মানুষ বঞ্চিত হয়, আর একদল মানুষ সুবিধাভোগী হয়। সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্যের শরিক হয়ে এতদিন যারা লড়াই করেছে, তারাই আজ সমস্ত পথচারীদের হটিয়ে, তফাৎ ক'রে দিয়ে পর-ঘর বিদেশী হয়ে ছুটছে দেশান্তরে। এই কবিতার শেষ স্তবকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতের অনুষঙ্গ আনলেন কবি। বলতে চাইলেন স্বর্গে সেই-ই জীবিত পৌঁছতে পারে, যে তার পথের অসহায় সহচরটিকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেয় না। অর্থাৎ আজ যদি আদর্শচ্যুত হন কেউ, কর্মবিমুখ হয়ে সুখভোগের নেশায় মাতেন, তবে যে পৃথিবীর সন্ধানে তারা দেশান্তরী হচ্ছেন, সেই পৃথিবীর সন্ধান কোনদিনই মিলবে না।

"আরো আগে, ইতিহাসেরও আগে, ওরা কারা?
ঐ ইন্দ্রপুরী-ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে
হিমালয়ের দিকে—
মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পঞ্চনায়ক ও তাদের সঙ্গিনী
স্ব-স্বরূপ-অনুরূপা—
যুদ্ধ জয় করেও যারা সিংহাসনে গিয়ে বসল না
কর্মফল বন্টন করল না নিজেদের মধ্যে,
ফলত্যাগ করে কর্মের আদর্শকে রেখে গেল উঁচু করে,
দেখিয়ে গেল প্রথমেই পতন হল দ্রৌপদীর—
পক্ষপাতিতার।
তারপর একে একে পড়ল আর সব অহঙ্কার
রূপের বিদ্যার বলের লোভের আগ্রাসের—
আরো দেখাল। দেখাল—
শুধু যুধিষ্ঠিরই পৌঁছয়
যেহেতু সে ঘৃণ্য বলে পশু বলে
পথের সহচর কুকুরকেও ছাড়ে না।"[৫]

পুরাণের রাধার সঙ্গে 'কথন' শব্দ যোগে সমাজের বাস্তবরূপের প্রকাশও এক প্রকার মিথের না প্রয়োগ।

১৯৮৬ সালে 'রাধাকথন' নামক একটি কবিতায় জয়দেব বসু সমাজতন্ত্রের আসল রূপটি উদ্ঘাটন করলেন। গদ্যকথনে লেখা এই কবিতায় কবি খুঁজলেন সেই আসল সত্যকে। যে সত্যের জন্য তার লড়াই চলেছে এতদিন। সোজাসাপ্টা ভাষায় কবি বললেন—

> ''তো, বন্ধুগণ, বক্তৃতা সমাজতন্ত্র নিয়ে। আমার বারোমাস্যায় দেখি ও শব্দের অনটন, অর্থাৎ ও শব্দের নীতিগত পাকা অবস্থান। এবং স্বপ্নাদেশে গতরাতে একথা জেনেছি— সমাজতন্ত্র ছাড়া এই পোড়ামুখে অন্ন, প্রাণ, চেতনা, অক্ষর... মোদ্দা কিছুই আর রুচিবেক নাই।''[৬]

'রাধেয় অধিরথ সুত' কবিতার মাধ্যমে মহাভারতের কর্ণের উপর হওয়া বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন কবি। জন্মাবধি সুতপুত্র কর্ণ 'বেজাত' পরিচয় নিয়ে বড় হয়েছে। অথচ তাঁর জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। কুন্তী একবারও দায় স্বীকার করলেন না কর্ণের। একবার ফিরেও দেখলেন না শিশুপুত্রটির কী হয়েছিল, কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল সে, আদৌ বেঁচে ছিল কিনা। কিন্তু কুন্তী তাঁর বৈধ পুত্রদের প্রাণভিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর এই অবৈধ পুত্রটির; কর্ণের জীবনের এই চরম অসহায়তাকে কোথায় যেন জয়দেব বসু বর্তমান সময়ের অজস্র নাম পরিচয়বিহীন শিশুর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। গদ্য কবিতাটির ছত্রে তুলে ধরলেন প্রতিবাদের অক্ষরমালাকে।

ভোজরাজ কন্যা কুন্তী যখন তাঁর বৈধপুত্রদের বাঁচানোর জন্য কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের কথা বলেন, তখন প্রতিবাদী কর্ণ বলে ওঠেন—

> ''নিছক কামের ঘোরে আপনার প্রথম প্রসব-জলে ফেলে দিয়ে যাকে স্বস্তি পেয়েছিল যত টুনটুনি নৈতিকতা উত্তরাপথের...শুধু সে যে ভেসে গিয়েছিল, মাংসের দলাটুকু ভেসে গিয়েছিল...সে যে কাঁদে, নড়ে-চড়ে, খেতে চায়, আদরও কিছুটা—এসব ভাবার কোনো সময় ছিল না। যান সাধ্বী, ফিরে যান, শেষকথা শুনে যান শুধু—সারা দুনিয়ার অন্ত্যজদের, সারা দুনিয়ার বেজন্মাদের কসম—আপনি আমার মা না। আমার বাবার নাম অধিরথ। মা-র নাম রাধা।''[৭]

এখানেই কবি সর্বাধিক প্রতিবাদী। পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে জয় হয়তো সুনিশ্চিত হতো কর্ণের। তবু পরাজয় মৃত্যুকে সে বরণ করতে চায়। অস্বীকার করতে চায় না পালক পিতা মাতাকে, তাঁদের দেওয়া পরিচয়কে। সমস্ত অবৈধ ভাবে জন্ম নেওয়া, অন্যের কাছে বড় হয়ে ওঠা শিশুদের হয়ে কর্ণ প্রতিবাদ করেছে এভাবেই।

পঞ্চাশের দশকের একটি বাস্তব মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, 'যমুনাবতী' কবিতাটি। পুলিশের গুলিতে নিরন্ন মানুষের মিছিলে থাকা কিশোরীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শঙ্খ ঘোষ গর্জে উঠলেন কবিতায়। কবির অদেখা সেই মেয়েটি হয়ে উঠল 'যমুনাবতী', সনাতন বাংলাদেশের মিথ যমুনাবতী-সরস্বতী। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছজ্ঞান করে, নিজের বিবাহবাসরকেও তুচ্ছ করে নিরন্ন মেয়েটি এগিয়ে গিয়েছিল মিছিলেন দিকে। বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের বন্দুকের সামনে। পুরাণের মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন শঙ্খ ঘোষ মেয়েটির প্রতিবাদী চেহারায়—

> ''চলল মেয়ে রণে চলল!
> বাজে না ডমরু, অস্ত্র ঝনঝন করে না, জানল না কেউ তা
> চলল মেয়ে রণে চলল!
> পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
> চলল মেয়ে রণে চলল!''[৮]

এ যেন স্বয়ং দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের উদ্যোগে যাত্রা। অস্ত্র সম্বল নেই, শুধু আছে মনের শক্তি, প্রতিবাদী নারীর মূর্ত প্রতীক এই মেয়েটির মৃত্যু স্তব্ধ করে দিতে পারেনি মানুষের প্রতিরোধের লড়াইকে, সেই-ই পেরেছে নিভন্ত চুল্লিতে আগুন ফলাতে।

মহাভারতে পাণ্ডবগণ একবছর বিরাট নগরে যে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, সেই মিথ-পুরাণের প্রসঙ্গ, বৃহন্নলা অর্থাৎ অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের ছদ্মনাম ইত্যাদি উঠে এল কবিতা সিংহের নারীকেন্দ্রিক একটি কবিতা— 'পৃথিবী দেখে না'তে, ভিন্ন আঙ্গিকে। মহাভারতের প্রসঙ্গ নতুন ভাষ্যে উপস্থাপিত হল।

"তারপর চলে যাও বিরাট রাজার ঘরে—
আহা যেন স্মৃতিভ্রষ্ট অজ্ঞাতবাসিনী
খুলে রেখে চলে যাও সত্যকার শ্রোণী
হাসো তুমি অপমানে ছিন্নভিন্ন, হাস্যে বিমোহিনী
যে ভাবে অনন্তকাল হাসে বৃহন্নলা
....."[৯]

— 'লখিন্দর' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনসামঙ্গলের বেহুলার মিথকে ব্যবহার করে পুরাণের নবমূল্যায়ণ করেছেন।

বেহুলাকে সতীত্বের প্রতিমূর্তি হিসাবে, নারীত্বের আদর্শ রূপের উদাহরণ হিসাবে সমাজ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে, স্বামীর পচনশীল দেহে নিজের সতীত্বের বিনিময়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও মন প্রতিষ্ঠা করতে কি সে পেরেছে? পুরাণ অতিক্রমী এটাই মনের জিজ্ঞাসা।

"সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত-পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে।"[১০]

অন্যদিকে, প্রতিবাদমুখর আরও এক আধুনিক বাংলা কবিতায় দেখা গেল মিথের অপরূপ প্রয়োগ—

"যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো!"[১১]

— এই বাক্যদ্বয়ের স্পর্ধিত উচ্চারণ 'যদি নির্বাসন দাও' কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোট চারবার পুনরাবৃত্ত করে ব্যবহার করেছেন। এই বাক্যদ্বয় এইভাবে পৌনঃপুনিকতায় ব্যবহৃত হয়ে কবিতাটির চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। এই বাক্যে রয়েছে ঐতিহাসিক কিছু মিথ। এই যে 'ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো।' আসলে এটি বাস্তব ঘটনা যে, অতীতে রমণীরা আত্মসম্মানরক্ষার্থে আঙুলে পরে থাকতেন বিষভর্তি অঙ্গুরি। চরম বিপদের সম্মুখীন হলে, তাঁরা সেই বিষপান করে আত্মহত্যা করতেন।

ইতিহাসে তৈমুর লঙের দস্যুবৃত্তি সবর্জনবিদিত। সেই মিথকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'তৈমুর' কবিতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করলেন। কবি তাঁর সমসাময়িক কালের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও ভয়াবহতাকে বর্ণনা করার জন্য অতীতের সেই তৈমুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন এইভাবে—

"রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বার প্রাসাদে কুটিরে
নির্জন বীভৎস শান্তি। .....
নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিরে সর্বখানে
দুরন্ত তাতার-দস্যু তৈমুরের পদচিহ্ন আঁকা।
তৈমুর এখানে আসে দস্যুর মতন,....."[১২]

'মনসামঙ্গলে'র বেহুলার মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসে যাওয়ার মিথকে এবং সর্বোপরি বেহুলার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেকে দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য সমর্পণ করে

দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে পৌরাণিকতার আবরণে রেখে আধুনিক নারীর ব্যক্তিসত্তায় রঞ্জিত করে উপস্থাপন করলেন কবি সব্যসাচী দেব তাঁর 'বেহুলা ভাসান' কবিতায়। কবিতাটি শুরু হয়েছে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে।

> ''হে দিকচক্রবালে নিহিত জবাকুসুমসংকাশ সূর্য
> এখনো বিলম্ব আছে তোমার উদয়ের; এখনো নক্ষত্ররা
> তাদের দরিদ্র আলো সাজিয়ে দিচ্ছে কুণ্ঠিত ভেলায়,
> কিন্তু আমার আর সময় নেই।''[১৩]

শেষ রাত্রের ছবি এই কয়েকটি বাক্যবন্ধে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। 'কিন্তু আমার আর সময় নেই'।— বেহুলার এই উচ্চারণে নারীর স্পষ্টবাদিতা লক্ষণীয়। নিজেই নিজেকে প্রতিকূল পরিবেশে স্মরণ করায় যে— ''আমাকে মনে রাখতে হবে আমি নারী,/আমার বৈধব্য এখনো তরুণ, আর/আমার সঙ্গী শুধু এক মৃত;''[১৪] মানুষের কিশোর বয়সকে চিহ্নিত করার জন্য যে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়— 'তরুণ', সেটি বৈধব্যের বয়স নির্ধারণে উল্লিখিত হল। বিষয়টির নতুনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশাপাশি অল্পকালের বৈধব্য বেহুলার অবস্থাকে স্পষ্ট করে দেয়। বেহুলা লখিন্দরকে শুধু স্বামীই নয়, স্বদেশভূমির সাথে তুলনা করে কখনও বলেছেন— 'আমার ভূমি', কখনও বা 'আমার সেই স্বদেশ', 'আমার স্বভূমি', 'আমার নতুন জন্মের আশ্রয়', 'প্রিয় আমার স্বদেশ আমার' ইত্যাদি। 'স্ব' অর্থাৎ 'নিজের'; এখানে স্বামী এবং জন্মভূমি একাত্ম হয়ে গেছে। পুরাণের যখন নবমূল্যায়ণ করা হয়, তখন পৌরাণিক মোড়কে পুরনো কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যুগোপযোগী বার্তা। নারী তাঁর নিজস্ব সম্ভ্রম বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। লক্ষ্য বিষয়েও স্থির।

> ''দ্রৌপদী নই, নই পাঞ্চালী, নই ভরতকুলবধূ,
> আমি কৃষ্ণা, যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা, শুধু নারী এক।''[১৫]

'কৃষ্ণা' দ্রৌপদীর অপর নাম। আত্মপরিচয়ের সংকটের জায়গা থেকে মহাভারতের দ্রৌপদী ফিরে যেতে চান শিকড়ের টানে। জন্মের স্মৃতি, যজ্ঞের আগুন মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখে স্বামী-পরিবার সকলকে কটাক্ষ করেন রূঢ় বাক্যে। এক্ষেত্রে তিনবার 'নই' ব্যবহৃত হয়ে দ্রৌপদী, পাঞ্চালী, ভরতকুলবধূ— এইসব পরিচয়কে জোর গলায় অস্বীকার করতে চান তিনি। তিনি 'কৃষ্ণা', 'যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা' বলে নিজেকে অভিভূত করে শুধু 'নারী' বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই এখানে কৃষ্ণা মহাভারতের চরিত্র হলেও মহাকাব্যের বাইরে জীবনসংগ্রামী নারীর সমতুল্য। বঞ্চিতা নারী গর্জে উঠেছেন মার্জিত ভাষায়।

কবি জয়দেব বসু 'আমার ভগবদ্‌গীতা' কবিতায় পৌরাণিক শব্দের ব্যবহারে ও ভাবনার আলোড়নে মাঝে অতীতচারিতা ঘটিয়ে, শেষে মিলিয়ে দিলেন বাস্তবেরই সাথে। অন্যায়-অত্যাচার দেখেও ঈশ্বরের স্তব্ধ হয়ে থাকাকে কটাক্ষ করে প্রতিবাদী কবি বলেন— ''আরাধ্য দেবতা আজ স্থপতিদানব সেই 'ময়',''[১৬] 'ময়' হলেন দানব-শিল্পী। 'মহাভারতে' উল্লেখ আছে ময়-দানবের। তিনি ছিলেন যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণকারী। বিশ্বকর্মার সাথে তুলনীয়। কবিতায় আরাধ্য দেবতাকে তুলনা করা হয়েছে 'ময়ে'র সাথে। ''যে-যাই বলুক, তবু দায় থাকে, জেনো পরন্তপ, /যে যুদ্ধ স্থগিত আজ, তুমি তার দধীচি ও শব।''[১৭] 'পরন্তপ' শব্দের অর্থ— শত্রুদমনকারী অর্থাৎ অরিন্দম। এক্ষেত্রে, নিরীহ ব্যক্তি অথচ যাঁকে বা যাঁদের আক্রান্ত হতে হয় যুগে যুগে— তারাই শেষে শত্রু দমন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই দমনের প্রতিবাদ হিসাবে কখনও তারা দেন প্রাণ। হয়ে যান 'শব'। কখনও তাঁদেরকে তুলনা করা হয় 'দধীচি'-র সঙ্গে। মিথ অনুযায়ী পৌরাণিক ঘটনাটি হল— বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচি আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাঁর তনুত্যাগ করেন এবং তাঁরই হাড় দিয়ে তৈরি হয় বজ্র। সেই বজ্রাঘাতে ইন্দ্র নিধন করেন বৃত্তাসুরকে। বাস্তবে তেমনি অত্যাচারিত, অসহায় মানুষকে শোষণ করে নিচ্ছে অত্যাচারীর দল। নীরক্ত দেহে দধীচির মতো হাড় দিয়ে তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন— অন্যায়ের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহে গর্জে উঠেছে নিপীড়িত জনগণ। কবিতাটির শেষে গিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মিলেমিশে গেছে। সেখানে একদিকে পার্থ, আরেকদিকে লেনিন— সমীকৃত করার চেষ্টা লক্ষণীয়। ''অস্বীকার করো পার্থ, কথা দাও, তুমিই লেনিন।''[১৮]

মল্লিকা সেনগুপ্ত 'ফ্রয়েডের খোলা চিঠি' কবিতায় প্রতিবাদের সুরে গর্জে ওঠেন কখনো পৌরাণিক চরিত্রকে হাতিয়ার করে। যেমন—

> ''পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ/দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাকে/ফ্রয়েডবাবুর মতো ওটি নেই বলে নারী হীনমন্য থাকে/পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি/প্রকৃতি সদয় নয়/পুরুষ সদয় নয়/সন্তান সদয় নয়/মেয়েদের প্রতি শুধু ফ্রয়েড সদয়! / এই দয়া কে চেয়েছে! চিত্রাঙ্গদা! জোন অব্ আর্ক'!/সিমোন দ্য বোভোয়া শ্যামল দ্রৌপদী।।''[১৯]

মিথ-পুরাণের নারীরা— প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সীমারেখা মুছে সবাই একসঙ্গে সরব হয়ে উঠেছেন— 'চিত্রাঙ্গদা', 'জোন অব্ কার্ক', 'সিমোন দ্য বোভোয়া', 'দ্রৌপদী'।

'ধর্ম আর রাজনীতি' কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত ধর্ম, রাজনীতির মতো জড় বিষয়ের উপর চেতন সত্তা আরোপ করলেন। যা সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ। ধর্ম আর মানুষের প্রেম, সেখান থেকে উত্তাল পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্কের ভাঙন দেখানো হয়েছে। আরও দেখানো হয়েছে ধর্ম কিভাবে রাজনীতিকে গ্রাস করতে চলেছে। এই চিত্রকল্পে আছে নারীনির্যাতনের আশঙ্কা। শক্তিধর ধর্মকে উল্লেখ করেছেন 'মাচো ধর্মরাজ' নামে। প্রতিবাদের অস্ত্র শাণিততর হয়ে উঠেছে মিথ-পুরাণের হাতে হাত রেখে।

> ''মাচো ধর্মরাজ গোঁফে তা দিতে তা দিতে
> মনে মনে ছক করে কী ভাবে শেকল আটকিয়ে
> রাজনীতি নামে এই মেয়েছেলেটাকে
> বানাবে ঘরের বউ,
> ইচ্ছে মতো প্রেম দেবে, যথেচ্ছ মারবে।''[২০]

মিথ-পুরাণের লোকশ্রুতি কবিতায় আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে হয়ে উঠছে সর্বকালীন সত্য। মিথ পুরাণের ব্যবহার তাই কবিতাকে করে তুলছে আরও নির্ভরযোগ্য। পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর সেই মন্তব্য অনুযায়ী পুরাণকথার বীজ বহু শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে নানা কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও ফল সৃষ্টি করে, যেগুলিকে বলা যায় মিথ-পুরাণের নবভাষ্য।

তথ্যসূত্র:

১. J. A. Cuddon, ed, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Reference Library, 1999, London, UK, Page 526.

২. বসু, বুদ্ধদেব। মহাভারতের কথা। অষ্টম মুদ্রণ, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ২৮।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত। বাংলা কবিতায় মিথ: শ্রেয়োবোধের অন্য অলিন্দ, দো-তারা—বিষয়: মিথ। প্রথম বর্ষ, সূচনা সংখ্যা, মার্চ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৫৮।

৪. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। পুরাণকাহিনি ও আধুনিক কবিতা, আধুনিক বাংলা কবিতা: স্বরূপে রূপে, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৫৬।

৫. জানা, বাপ্পাদিত্য (সম্পা.)। আন্দোলন ঘটনা ও কবিতা': বঙ্গভঙ্গ থেকে সাম্প্রতিক। প্রথম সংস্করণ, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৩৩।

৬. বসু, জয়দেব। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৭।

৭. তদেব, ১১।

৮. ঘোষ, শঙ্খ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। ষোড়শ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ২১।

৯. সিংহ, কবিতা। পৃথিবী দেখে না, কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৭-১৮।

১০. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। বেহুলা, লখিন্দর, ড. অশোককুমার মিশ্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা। প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ৮৩।

১১.গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। যদি নির্বাসন দাও, আমার প্রশ্ন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৮৯-৯০।

১২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। তৈমুর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। ষোড়শ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৯-২০।

১৩. দেব, সব্যসাচী। বেহুলা ভাসান, সব্যসাচী দেবের শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০০৭, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৭।

১৪. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৫. তদেব, কৃষ্ণা, পৃ. ৪২।

১৬. বসু, জয়দেব। আমার ভগবদ্‌গীতা, জয়দেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১৪৬।

১৭. তদেব, পৃ. ১৪৬।

১৮. তদেব, পৃ. ১৪৬।

১৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। ফ্রয়েডের খোলা চিঠি, সুজিত সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত ও নারীবাদী কবিতা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, লেখিকাদের লেখালেখি (তাপস ভৌমিক সম্পাদিত), বইমেলা ২০১৭ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩০৭।

২০. তদেব, ধর্ম আর রাজনীতি, পৃ. ৬৮।